গুঞ্জন

গুঞ্জন

গুঞ্জন

গুঞ্জন

গুঞ্জন

ডিসেম্বর মাসটি হল পবিত্র প্রভু যীশুর আবির্ভাবকাল। তিনি মানুষকে শিখিয়েছিলেন মানব-প্রেমের পথ। আমরা চাক্ষুষ দেখেছি, তাঁর শিক্ষায় অনুপ্রাণিতা মাদার টেরেজাকে, বিদেশিনী হয়েও যিনি ভারতের কত নিপীড়িত-পীড়িত, অসহায়-অনাথ মানুষদের জন্য সেবাশ্রমের মাধ্যমে জীবন অতিবাহিত করেছিলেন। কিন্তু বর্তমানে কল্যাণের পথই হয়ে উঠছে রাজনৈতিক কূটনীতির আঁতুড়ঘর। রাজনীতির নামে চলছে কুচক্র, দ্বন্দ্ব, লুঠরাজ ও অরাজকতা। কতকাল, আর কতকাল চলবে এই অধঃপতনের খেলা?

মাসিক ই-পত্রিকা

বর্ষ ৩, সংখ্যা ৭

ডিসেম্বর ২০২১

গল্প সংখ্যা

কলম হাতে

ডাঃ অমিত চৌধুরী, ডঃ মালা মুখার্জী, পিনাকী রঞ্জন বিশ্বাস, শান্তিপদ চক্রবর্তী, রিয়া মিত্র, অনির্বাণ বিশ্বাস, সামিমা খাতুন এবং পাণ্ডুলিপির অন্যান্য সদস্যরা...

প্রকাশনা

পাণ্ডুলিপি (গল্প, কবিতা, গান, গদ্য ও নাটকের আসর)

বি.দ্র.: লিটল ম্যাগাজিন হিসাবে মুদ্রিত এই পত্রিকাটির প্রথম প্রকাশ হয় ইং ১৯৭৭ সালে...

যোগাযোগের ই-মেলঃ contactpandulipi@gmail.com

পায়ে পায়ে

চোখের পলকে একটা বছর নিমেষের মধ্যে শেষ হয়ে এল। সত্যিই সময় বড়ই নিষ্ঠুর। সময় ভালো-মন্দ, আশা-নিরাশা সব কিছুকে আপন চলার তালে দ্রুত এগিয়ে নিয়ে চলে, আগামী ভবিষ্যতের দিকে। তবে গত দু'বছর ধরে সময়কে এক মারণ রোগ কুঁড়ে কুঁড়ে শেষ করে দিচ্ছে। যার ফলে আমাদের জীবনের বেশিরভাগ সময়টাই উৎকণ্ঠার মধ্যে কাটছে। গত দু'বছরে করোনার ভেরিয়েন্ট আমাদের যেভাবে গৃহমুখী ও আতঙ্কিত করে তুলেছে, তা ভাষায় প্রকাশ করা বেশ কঠিন। তবে যখন বিশ্ববাসী আবার প্রাণ খুলে বাঁচার পরিকল্পনা করছে, ঠিক তখনই আমাদের সামনে ওমাইক্রনের আতঙ্ক মাথা চারা দিয়ে উঠেছে। ইতিমধ্যে বেশ কিছু দেশ এই ভাইরাসের প্রকোপে আক্রান্ত হচ্ছে। আগামী দিনগুলো কোন নতুন অশনি সংকেত নিয়ে আসতে চলেছে আমাদের জীবনে, তা গভীরভাবে ভাববার বিষয়। তবে পরিস্থিতি ইতিবাচক কিংবা নেতিবাচক যাই হোক না কেন, আমাদের নিজেদের সাবধানতা নিজেদেরই নিতে হবে। কারণ লড়াই যতই কঠিন হোক পিছ-পা না হয়ে, তার মোকাবিলা করতে হবে। আসন্ন বড়দিনে বড় হয়ে উঠুক মানুষের প্রাণের বার্তা। সবাই সুস্থ থাকুন ও সবাই ভালো থাকুন। ■

বিনীতাঃ রাজশ্রী দত্ত (নীলাঞ্জনা), সম্পাদিকা, গুঞ্জন

বিনীতঃ প্রশান্তকুমার চট্টোপাধ্যায় (পিকে), নির্বাহী সম্পাদক, গুঞ্জন

কলম হাতে

অনিবার্য কারণ বশত দীপঙ্কর সরকার-এর ধারাবিহিক কাহিনীটি এবারে প্রকাশ করা সম্ভব হোলনা।

নতুন বই

প্রতি পাতায় ভরা হাসি

যা কখনও হয়না বাসী...

সুসাহিত্যিক পিনাকি রঞ্জন বিশ্বাসের একটি অপূর্ব

রম্য রচনার সমাহার...

প্রাপ্তিস্থলঃ

https://www.rokomari.com/book/202818/rong-delivery

ভারতে শীঘ্রই আসছে...

নমামি দেবী নর্মদে

শিব দুহিতা নর্মদা

ডাঃ অমিত চৌধুরী

পঞ্চম পর্যায় (৪)

আজ ২৩শে ফেব্রুয়ারী নর্মদা সঙ্গমে স্নান এবং আরতি করে এগিয়ে চলেছি। লক্ষ্য হোসেঙ্গাবাদ, দূরত্ব বারো কিলোমিটার। দুধারে প্রচুর ফলের গাছ। জায়গাটি নামের সাথে খুবই মানানসই। দুপুর বারোটার সময় এসে পৌঁছালাম নর্মদাপুরে অর্থাৎ হোসেঙ্গাবাদে। ঘাটের পাশে নাগেশ্বর মহাদেবের মন্দিরের দিব্যানন্দজী আমাদের এনে তুললেন। আলাপ হল জ্ঞানী মহারাজের সাথে, হিন্দিভাষী হলেও ভালো বাংলা বলেন।

দুপুর দু'টো। সূর্যের তাপ মাথায় নিয়ে বেরিয়ে পড়েছি। কতদূর যেতে পারবো জানি না। শহরের পথ ছেড়ে আসতে আসতে গ্রামের পথ ধরেছি। শহরের শেষ প্রান্তে একটি কালো কুকুর আগেরবারের মতো আমাদের সঙ্গী হল। আসতে আসতে শহর ছেড়ে গ্রাম। গ্রাম ছেড়ে জঙ্গলের পথ, আমরা এগিয়ে চলেছি। সারমেয়টি আমাদের সঙ্গী। বসার জায়গা নেই। দাঁড়িয়েই বিশ্রাম নিতে হচ্ছে। পিপাসার জল নেই। খুব করুণ অবস্থা। দূরে যেতে হলো না। পাহাড়ের বাঁক ঘুরতেই দেখতে পেলাম একটি শিব মন্দির। ওখানেই

নমামি দেবী নর্মদে

আজকের মতো আসন পাতলাম।

গ্রামটির নাম হসোলপুরা। এই গ্রামটি শুনলাম মধ্যপ্রদেশের বিধানসভার স্পিকারের বিধায়ক কেন্দ্র। রাতে আরো দু'জন পরিক্রমাবাসীর সাথে আমরাও উত্তম দাসমিনারের কাছ থেকে সদাবর্ত পেলাম। এই পরিবারটি তিন পুরুষ ধরে পরিক্রমাবাসীদের সেবা করে আসছে।

নর্মদে হর।

...ক্রমশ ■

স্মারক

সামিমা খাতুন

স্মৃতির বলিরেখা শরীর জুড়ে,
সময়ের ফেরে স্থান আস্তাকুঁড়ে,
পরিচয় হারানো, নতুনের ভিড়ে,
একলা, জীর্ণ, দীর্ঘশ্বাস ছাড়ে।

দুঃসাহসী পাখি গেলে উড়ে,
পায়ের বেড়ির বাঁধন ছিঁড়ে,
পালকের স্তূপ বাসি নীড়ে,
স্মারক হয়ে থাকে পড়ে।।■

ঐতিহাসিক

আকালী

ডঃ মালা মুখার্জী

সাল ১৭৭৪, আজ কাশীর আকাশে বাতাসে তুমুল উত্তেজনা। দীর্ঘকাল বাদে আবার খুলবে কাশী বিশ্বনাথের দ্বার, সসম্মানে প্রতিষ্ঠিত হবেন বিশ্বনাথজী, যিনি দীর্ঘ একশত বছরেরও বেশী সময় ধরে এক কুয়োর মধ্যে রয়েছেন, তিনি (কাশী বিশ্বনাথ) শত বৎসর পর বুঝি, আবার তাঁর ভক্তদের দিকে মুখ তুলে চাইলেন, নইলে কেনই বা হোলকার রাজ্যের রাজমাতা অহল্যাবাঈ এক অদ্ভুত স্বপ্নাদেশ পেয়ে ছুটে আসবেন? ভক্তিমতি রাণী স্বপ্নাদেশ পান, তাঁর আরাধ্য শিব গৃহহীন, এক অন্ধকারকূপে প্রবল শীতে কষ্ট পাচ্ছেন। পর পর তিনরাত্রি স্বপ্ন দেখার পর এক উগ্রতেজা ব্রাহ্মণ উপস্থিত হন তাঁর ধর্মশালায়। তিনি কাশীর বিশ্বনাথের পুরোহিতের বংশধর। কথায় কথায় রাজমাতাকে বলেন, "যদি সত্যিই তাঁর আরাধ্যকে প্রসন্ন করতে চান তো বাদশা আলমগীরের সময় ভাঙ্গা শিবমন্দিরগুলির যেন পুনর্নির্মাণ করেন?"

"আমার প্রপিতামহ এককালে কাশী বিশ্বনাথের পূজারি ছিলেন। যেদিন গঙ্গাবক্ষে বাদশার জলযান সুন্দরী হারেমবাসিনীদের নিয়ে জলবিহারে বেরিয়ে ছিল, আর তাঁর

হারেমবাসিনীর একজন কোনো সেনাপতির সাথে পলায়ন করে, সেদিনও আমার সেই পূর্বপুরুষ রোজকার মতো শিবার্চ্চনায় লীন ছিলেন। ঠিক তখনই বাদশাহী সেনা আক্রমণ করে। তাদের ধারণা অনুযায়ী সেই রাজঅন্তঃপুরীকা কোনো পুরোহিত-তনয়ের সাথে প্রেমে লিপ্ত ছিল। শত শত সন্ন্যাসী আর সাধারণ মানুষ সেদিন প্রায় নিরস্ত্র অবস্থায় সুশিক্ষিত মোঘলফৌজের সামনা করেছিল। রক্তে ভেসে গিয়েছিল বারাণসী, আমার প্রপিতামহ শিবলিঙ্গটি বুকে করে জ্ঞানকুয়োয় ঝাঁপ দেন। সেই কুয়ো হতে তাঁর দেহ বা শিবলিঙ্গ আজও উদ্ধার হয়নি।"

রাজমাতা ভারী আশ্চর্য্য হয়েছিলেন শুনে, "কেন? কুয়োতে তল্লাসী করা হয়নি?"

"ওই কুয়ো কোনো সাধারণ কুয়ো নয়, রাণীমা। অনন্ত কুয়ো, পাতাল অবধি বিস্তৃত এই কুয়োতেই নাকি প্রকটিত হয়েছিলেন অনাদি অনন্ত জ্যোতির্লিঙ - যিনি ব্রহ্মা আর বিষ্ণুকে সদাশিবের অনন্ততত্ত্বের জ্ঞান উপলব্ধ করান। তাই এই কুয়ো হতে কোনো কিছু উদ্ধার তখনই হবে, যখন তা প্রভু স্বয়ং চাইবেন..."

হোলকার রাণী অহল্যাবাঈ এরপর শুরু করলেন এক নতুন সংগ্রাম। বর্তমানে কাশী আর মুঘল সাম্রাজ্যের অংশ নয়, মুঘলদের সেই প্রতাপ অস্তমিত হয়েছে বহুকাল, বাদশাহ আলমগীরের মৃত্যুর সাথে সাথেই। এখনকার

বাদশাহরা নামেই বাদশাহ, আসল ক্ষমতা অভিজাতদের হাতে। ইতিমধ্যেই ভারতের রাজনীতিতে প্রকটিত হয়েছে ব্রিটিশ, ফরাসী আর পর্তুগীজদের মতো কয়েকটি বিজাতীয় বাণিজ্যিক শক্তি। বাংলায় নবাবি শাসনের অন্ত হয়েছে, হয়তো ভারতেও হবে, হয়তো সনাতনী হিন্দুদের নিকট এও এক বিশেষ দৈবযোগ।

রাণী অহল্যাবাঈ যখন কাশী বিশ্বনাথকে পুনরুদ্ধারের সংকল্প নেন, তখনও কাশী অযোধ্যার নবাবের অধীন। নবাব রাজি হলেন না। মসজিদের স্থানে মন্দির? এ তো ধর্মবিশ্বাসে আঘাত!

স্থিতধী অহল্যাবাঈ বললেন, "মসজিদের পাশে নতুন জমিতে মন্দির বসাবো। আপনি অনুমতি দিন কুয়ো হতে শিবলিঙ্গ উদ্ধারের।"

এভাবে নবাবের অনুমতি আদায় হলেও খুশী হলেন না কট্টর হিন্দুসমাজ। নতুন জমিতে মন্দির নির্মান করা গেলে বহু পূর্বেই তা হত না কি?

ভারতের রাজনীতিতে তখন দ্রুত প্রেক্ষাপট পরিবর্তিত হচ্ছে। রাণী যখন কাশীতে এলেন তখন ইংলিশ ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর দৌলতে মহারাজ চৈত সিং স্বাধীন রাজত্ব পেয়েছেন। কাশীরাজ দৌড়ে এলেন, "আর নবাবের অনুমতির তোয়াক্কা কেন? রাণীমা, বলেন তো পুরানো স্থানেই হতে পারে কাশী বিশ্বনাথের মন্দির..."

"না," রাণী অহল্যাবাঈ বললেন, "আমি নবাবের নিকট প্রতিজ্ঞাবদ্ধ, আর অতীতের ভুলকে কখনো ভুল দিয়ে শোধরানো যায় না।" মহারাজ চৈত সিং মনোক্ষুন্ন হলেন। কাশীর ব্রাহ্মণসমাজ মুচকি হাসলেন, "বিশ্বনাথ কখনোই ওই কূয়ো হতে উঠবেন না। নতুন স্থানে কখনোই বসবেন না।"

তবুও হোলকার মহারাণী আজ কুয়ো হতে শিবলিঙ্গ উদ্ধারের জন্য শত শত শ্রমিক লাগিয়েছেন। তিনদিন তিনরাত হয়ে গেল, কুয়োর কোনো শেষ নেই। কোথাও পাওয়া গেল না শিবলিঙ্গ। ব্রাহ্মণ প্রধান নীলকন্ঠ মিশ্র বলে চলেছেন, "বিশ্বনাথ স্বয়ম্ভূ। তিনি নিজে না চাইলে কখনোই প্রকটিত হবেন না।"

রাণী একমনে ডেকে চলেছেন দেবাদিদেবকে। ভোররাতে স্বপ্ন দেখলেন, শ্মশানের চারদিকে চিতা জ্বলছে, তার মাঝে দাঁড়িয়ে এক ভয়ঙ্করী চতুর্ভুজা ভীমা মূর্তি, তাঁর পাদতলে শিব। তিনি অট্টহাসি হাসছেন আর বলছেন, "আমি পাতালবাসিনী আকালী..."

রাণীর নিদ্রা ভঙ্গ হল। বড় ভয়ানক এই স্বপ্ন, কিন্তু ইঙ্গিত সুস্পষ্ট, কালী ছাড়া শিব শব, তার মানে তাঁকে দেবী কালীকার পুজো করতে হবে। কাল দীপান্বিতা অমাবস্যা কালই দেবীর পুজো মনস্থ করলেন রাজমাতা। কিন্তু কালীপুজো তো যে সে পুজো নয়, এত শিগগিরি মূর্তি পাবেন কোথায়?

সকালের আহ্নিক শেষ হওয়ার আগেই খনিকদের সর্দার দৌড়ে এলো। "রাণীমা, রাণীমা, এক আশ্চর্য্য হয়েছে। কুয়ো থেকে উঠেছে এক ভীষনা দেবীমূর্তি।"

রাজমাতা দৌড়ে গেলেন। কী ভীষণ সেই মূর্তি! দেবী শ্যামবর্ণা, দ্বিভূজা, গলায় পঞ্চাশটি নরমুণ্ডের মালা; কটিতে ক্ষুদ্র কৃষ্ণবস্ত্র, কানে দুটি শিশু-শব, কাঁধে নাগযজ্ঞোপবীত, দাঁতগুলি মহাশঙ্খ দিয়ে তৈরী, মাথায় জটা, অর্ধচন্দ্র, চতুর্দিকে নাগফণা দ্বারা বেষ্টিতা ও নাগাসনে উপবিষ্টা; বামকঙ্কণে তক্ষক সর্পরাজ ও দক্ষিণকঙ্কণে অনন্ত নাগরাজ; বামে বৎসরূপী শিব। সবচেয়ে আকর্ষণীয় হল মূর্তিটিতে দুর্লভ মণিমুক্তো খোদিত রয়েছে।

রাজপুরোহিত নীলকণ্ঠ মিশ্র এগিয়ে এলেন, রাজা চৈত সিংও সদলবলে এলেন। অনেকেই সেই দেবীমূর্ত্তি দেখে ভীত হয়েছে। নীলকণ্ঠ মিশ্র বললেন, "এ কি? ইনি তো পাতালের অধীশ্বরী দেবী গুহ্যকালী, এঁর অপর নাম আকালী। শ্মশান-বাসিনী এই মাতৃকা, দেবী শতাক্ষীর দেহ হতে উৎপন্না হন।"

"কাল রাতে আমি এঁরই স্বপ্ন দেখি," রাজমাতা বললেন, "দেবীর পায়ের তলায় শিব। এখন মনে হচ্ছে পাতালেশ্বরীর পুজো না করলে বিশ্বনাথের স্বয়ম্ভূলিঙ্গ প্রকটিত হবেন না।"

"না, না, না," নীলকণ্ঠ মিশ্র বলে উঠলেন, "দেবী আকালীর পুজো কোনো ছেলেখেলা নয়। ইনি দ্বাপরে মগধরাজ জরাসন্ধের আরাধ্যা ছিলেন। দেবীর এইরূপ অসুরলোকে

পূজিত, মনুষ্যলোকের সাধারণ গৃহস্থের নিকট নয়।”

রাজমাতা পড়লেন মহাসংকটে। এখন উপায় কি? মহারাজ চৈত সিং এগিয়ে এলেন, “গুরুদেব, রাজবাড়ীতে না হোক মণিকর্ণিকার মহাশ্মশানে তো পূজা হতেই পারে, নয় কি? নাহলে পাতাল থেকে স্বয়ম্ভূলিঙ্গ কিভাবে প্রকটিত হবেন? ”

নীলকণ্ঠ মিশ্র নিমরাজি হলেন। কিন্তু শুরু হলো মহাশ্মশানে দেবী আকালীর বন্দনা। ঠিক এমনই সময়ে কোম্পানির দূত এক বিশেষ খবর নিয়ে এলো, “মহারাজ, লর্ড ওয়ারেন হেস্টিংস ওয়ান্টস টু সেলিব্রেট দীপাবলী উইথ দ্য নিউ মহারাজা অব বারাণসী, অ্যাণ্ড রাজমাতা অব দ্য হোলকার ডাইনেস্টি।”

“এ তো আমাদের পরম সৌভাগ্য,” রাজপুরোহিত বললেন। “লর্ড হেস্টিংসের জন্যই পবিত্র বারাণসী আজ পুরোপুরিভাবে নবাবী শাসনমুক্ত হয়েছে। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি হিন্দুদের পরম মিত্র।”

বারাণসী সেই দীপাবলীর রাতে সাজলো নববধূর মতো। লর্ড হেস্টিংস একা আসছেন না, বাংলার দিওয়ান মহারাজ নন্দকুমারও আসছেন, আর আসছেন লর্ড হেস্টিংসের বাল্যবন্ধু স্যার এলাইজা ইম্পে ও তাঁর স্ত্রী মেরি। স্যার ইম্পের হাতেই এখন কোম্পানি অধ্যুষিত অঞ্চলের বিচারব্যবস্থা। আর আসছেন বাংলার শেঠ মোহনপ্রসাদ। মহারাজ চৈত সিং মহাসমারোহে কালীপূজার আয়োজন করলেন। ...ক্রমশ ■

নূর

পিনাকী রঞ্জন বিশ্বাস

পুরনো দিনের দেয়াল ঘড়িটা প্রতিদিনের মতো আজও মাঝ রাতে দু'বার ঢং করে বেজে গেছে, এ শব্দ কোনদিনই দীপু শুনতে পায় না। এর আগেও ঘড়িটা বারো বার এমনই ঢং ঢং শব্দ করে জানিয়ে দিয়ে গেছে জীবনের চব্বিশটি ঘন্টা তুমি পার করে ফেলেছো, আসছে নূতন দিন – স্বপ্নের মোড়কে নয়, যা কিছু করবার তাকে বাস্তবে রূপ দাও। হয়তো এ সময়টা দীপু স্বপ্নে পদ্মার চরে বসে ছোটবেলার সাথী নূরের সাথে নূতন গল্পের বইয়ের আলোচনা নিয়ে ব্যস্ত কিংবা নূর আজ যে নূতন ধরনের খাবার করে এনেছে সেটা দু'জনে বসে খাচ্ছে।

রাজশাহী শহরে নূর আর দীপু ছোট থেকে এক সাথে বড় হয়ে উঠেছে। এক সাথে খেলাধুলো, এক সাথে স্কুলে যাওয়া, এমন কি স্কুল জীবন শেষ করে কলেজ জীবনও তাদের এক সাথে। এই পদ্মার চর ওদের দু'জনের জীবনের সাথে একাত্ম হয়ে গেছে। গ্রীষ্মের দাবদাহে প্রাণ যখন ওষ্ঠাগত, বিকালে চরের ঠান্ডা হাওয়ায় ওরাও বাতাসে গা ভাসিয়ে দিত, ভুলে যেত ঘরে ফেরার কথা। এই বাতাসেই তারা পেত কালবৈশাখীর আগমনী বার্তা। তাকিয়ে থাকতো

অনুরাগ

আকাশে বিছানো কালো সামিয়ানার দিকে, মধ্যদিনে অমানিশা। যেখানে ভীত বকদের ঘরে ফেরার তাড়নায় রং হয়ে উঠত আরো উজ্জ্বল সাদা, অবাক হয়ে দেখতো হাওয়ার বিরুদ্ধে তাদের ডানা থমকে যাওয়ার দৃশ্য, দূরে নদীতে বেড়ে যেত মাঝিদের দাঁড় টানার গতি, নৌকা পাড়ে ফেরানোর মরিয়া চেষ্টা। কালবৈশাখী দূর থেকে হাওয়ার তীব্রতা বাড়িয়ে বলতো ঘরে ফিরে যাও। ঘরে ফিরে শুনতে পেত টিনের চালে বৃষ্টির রেওয়াজ। এক অদ্ভুত আনন্দে মনটা ভরে উঠত। বর্ষায় চর যেত ঢেকে, পদ্মা ফিরে পেত তার যৌবন, তখন সে ভয়ঙ্করী। স্রোতের নীচে হারিয়ে যেত তাদের প্রিয় চর। শরতের শুরুতে নূতন রূপে জেগে উঠত সেই চর। কাশফুলেরা দূর থেকে দিত হাতছানি, ওরা চরে বসে নীল আকাশের বুকে ভেসে যাওয়া মেঘেদের নিয়ে করতো খেলা। মনের তুলিতে মেঘেদের নিয়ে আকাশের বুকে ফুটিয়ে তুলতো বাস্তবে দেখা জিনিসের অবয়ব। কৃষকেরাও আনন্দে লাঙ্গল নিয়ে নেমে পড়ত চরে। কর্দমাক্ত সেই চরে পড়ে যেত এক সবুজ প্রলেপ। একদিন শরৎ না বলে কয়ে বিদায় নিত। সন্ধ্যার আগেই হেমন্তের হিম জানিয়ে দিত সময় হয়েছে ঘরে ফেরার। এগিয়ে আসত পরীক্ষার দিন। উত্তরের হাওয়া জানিয়ে দিত শীতের আগমন বার্তা। আলোয়ানের আড়ালে শীতের মিষ্টি রৌদ্র গায়ে মেখে ওরা বসতো গিয়ে চরে, চলতো নানা খুনসুটি।

অনুরাগ

এক সময় উত্তরে হাওয়া যেত থমকে, দখিনা বাতাস জানিয়ে দিত বসন্ত জাগ্রত দ্বারে। প্রকৃতির সাথে এ ভাবেই দুই বন্ধুর বেড়ে ওঠা।

নূর উদার মনস্ক এক বনেদি সচ্ছল মুসলমান পরিবারের মেয়ে। দুধে আলতা গায়ের রং, এক ঢাল ঘন কালো চুল, অপূর্ব তার মুখশ্রী। সে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ে। দীপু মধ্যবিত্ত এক হিন্দু পরিবারের ছেলে। গায়ের রং উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ, সুঠাম দেহ, উজ্জ্বল কালো চোখ দুটি যেন সব সময় কথা বলছে। সেও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিসংখ্যান নিয়ে পড়ে। পাড়া প্রতিবেশী এমন কি দু'পরিবারের সবাই ওদের এই বন্ধুত্বটাকে বেশ সমীহ করে। দুই ধর্মের মানুষই ওদের বন্ধুত্বকে শ্রদ্ধা করে। রমজান মাসে নূরের যখন রোজা চলে দীপু ভুলেও তার সামনে খায় না, এমন কি খাবার কথাও তোলে না। চড়ে বসে দুজনে একসাথে ইফতার করে। ঈদের দিন নূরের বাড়িতে দু'জনে একসাথে হৈ হৈ করে। আবার দুর্গা পূজার সময় প্রতিদিনই নূর আর দীপু একসাথে ঘুরতে বের হয়। তখন নূর বেশির ভাগ সময়টা দীপুর বাড়িতে কাটায়। দীপু মনে উচ্চাশা পোষন করে কিন্তু কোনদিনই তা প্রকাশ করে না। নূর অনেক বার জানতে চেয়েছে পড়া শেষ করে সে কি করবে? দীপু খুব সুন্দর ভাবে তা এড়িয়ে গেছে। নূর বুঝতে যে পারেনি তা নয় তবে এ নিয়ে কোনদিন সে দীপুকে জোরাজুরি করেনি।

অনুরাগ

আজ রাতে দীপুর চোখে ঘুম নেই। দেওয়াল ঘড়িটা দ্বিতীয় বার ঢং করে বেজে জানিয়ে দিয়েছে রাত দেড়টা বেজে গেছে। হাতে সাহিত্যিক রনজিৎ কুমার সেনের নুতন গল্পের বইয়ের একটা পাতার কয়েকটা লাইন বার বার পড়ে চলেছে।

"জীবন সমুদ্রে কতই তো তরঙ্গ! তার সব ক'টাই ফেনসিক্ত বুদ্বুদ মাত্র নয়, কিছু শঙ্খধবল মাণিক্যেও তা আচ্ছন্ন। পরম দুঃখেও যদি সেই মানিক্যময় কিছু রত্ন এই ক্ষুদ্র জীবনে সার্থক সঞ্চয় হয়ে থাকে, তবে তাই হোক নির্মম আনন্দ। কিন্তু সেই আনন্দ কি শুধু একটি বিশেষ 'আমি'র-ই? 'আমি' যেখানে সমষ্টি - মনের বিরাট সেতারের নানা তারে একীভূত ও একই সুরে অনুরণিত, সেখানে 'আমি' র আনন্দ ছড়িয়ে থাক সেই সমষ্টিতে - যারা কালও ছিল, আজও আছে, আগামীকালও থাকবে।"

মাথার মধ্যে সব কেমন যেন তালগোল পাকিয়ে যাচ্ছে। নিজেকে প্রশ্ন করে চলেছে কোথাও কি কিছু ভুল করছে? তার উচ্চাশার স্বপ্নগুলো এক এক করে মাথার মধ্যে লাইন করে দাঁড়াতে থাকে। সকালে মায়ের ডাকে ঘুম ভাঙ্গে। মা ব্যাকুল হয়ে জিজ্ঞেস করেন, "বাবা তোর শরীর ঠিক আছে তো? এত বেলা পর্যন্ত কোনদিন শুয়ে থাকিস না তো!" হাসি মুখে প্রশ্ন এড়িয়ে বাথরুমের চলে যায় দীপু। বাথরুম থেকে বেড়িয়ে মাকে বলে, "খেতে দাও, ইউনিভার্সিটি যাবো।"

অনুরাগ

নূর খেয়াল করে দীপু আজ যেন খুবই অন্যমনস্ক বরং অন্য দিনের থেকে কিছু একটা নিয়ে বেশ চিন্তিত। নূর জানতে চায় সে আজ পদ্মার চরে যাবে কিনা? দীপু ঘাড় নেড়ে বলে “না।” সামনে ফাইনাল পরীক্ষা তাই বাড়ি ফিরে পড়তে বসবে। পড়াশোনায় দীপু বরাবরই ভালো, তাই নূর তাকে জোরাজুরি করে না। দিন গড়িয়ে চলেছে। নূর খেয়াল করে দীপু এখন খুবই চুপচাপ হয়ে গেছে। কথা বলে, কিন্তু তার মধ্যেও কেমন যেন একটা উদাসীন ভাব। আগে নূর কোন টিফিন আনলে দীপু প্রায় পুরোটাই উদরস্থ করত। এখন দিলে খায়, কিন্তু সেই আগের উচ্ছ্বাসটা তেমন নেই। আজকাল ইউনিভার্সিটির ক্লাস শেষ করেই বাড়ি ফিরে যায় সে। নূর এ নিয়ে কিছু ভাবে না। সে ছোট থেকে দীপুকে দেখে আসছে।

ফাইনাল পরীক্ষার আর বেশি দেরি নেই। সেদিন ইউনিভার্সিটিতে দীপু খেয়াল করে নূরের মুখটা কেমন যেন লাগছে, কিছু একটা বলতে চাইছে অথচ বলতে পারছে না, চোখের কোণায় জোর করে ধরে রেখেছে দু’ফোঁটা জল। দীপু জানতে চায় তাকে আজ কেন এমন লাগছে? নূরের চোখের জল এবার বাঁধ ভেঙ্গে কপোল বেয়ে নামতে থাকে। কোনমতে কাঁপা কণ্ঠে অনুরোধ করে আজ বিকালে একবার চরে যেতে।

ক্লাসের শেষে পদ্মার চরে গিয়ে বসে দু’জনে। আকাশ

অনুরাগ

জুড়ে ঘন মেঘের আস্তরন, বিকালের আগেই গোধূলি। দীপুকে এই প্রথম জড়িয়ে ধরে কান্নায় ভেঙ্গে পরে নূর। দীপুর সারা শরীরে এক বিদ্যুৎ তরঙ্গ বয়ে যায়, সে নিজেকে সামলে নিয়ে জানতে চায় কি হয়েছে? অনেকক্ষন চুপ করে থেকে নূর বলে, "তোকে বলা আর দেওয়ালকে বলা এক, তুই বুঝবি না।" দীপু তবু জানতে চায়। অতি কষ্টে নূর বলে, আজ তার বিয়ের কথা পাকা হয়ে গেছে। "বাবা খুঁজে পেতে রাজপুত্র জোগাড় করেছেন আমার জন্য। ছেলে আর্মির বড় অফিসার। মা-বাবার একমাত্র ছেলে, একটি বোন আছে, সে আমার থেকে এক বছরের বড়। এখনো তার বিয়ে হয়নি।" অনেকক্ষন চুপ করে থেকে দীপু শুধু জানতে চায় কবে বিয়ে। নূর বলে, "তোর ফাইনাল পরীক্ষা যেদিন শেষ হবে সেদিনই।" "আর তোর ফাইনাল পরীক্ষা?" দীপু কেমন যেন চিন্তিত হয়ে পড়ে। চাপা স্বরে নূর বলে, "এ বছর আর হবে না সামনের বছর চেষ্টা করব, আরো কিছু একটা বলতে গিয়েও যেন সে বলতে পারলো না। তার চোখের ভাষা দীপুকে বলতে চাইছে তোর কি কিছুই করার নেই? দীপুর চোখের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে নিঃশব্দে নীরবে একটা ঢোক গিলে নেয় সে। ঘনান্ধকারে পদ্মার চর আজ ফাঁকা। টিপটিপ বৃষ্টির ফোঁটা মোটা হয়ে মুষলধারে পড়া শুরু হয়ে গেছে। অমানিশা শুধু আকাশে নয় গ্রাস করেছে দীপুর মন। সে ঘন কালো আকাশের দিকে

চেয়ে থাকে। নূরের অলক্ষ্যে তার দু'চোখের জলের ধারা বৃষ্টির জলে একাত্ম হয়ে যায়। আস্তে আস্তে দু'জনই দু'জনার বাড়ির দিকে পা বাড়ায়।

রাতে খেতে বসে দীপু অনুভব করে আজ তার গলা দিয়ে যেন কিছুই নামতে চাইছে না। মা উৎকণ্ঠিত হয়ে পরেন। ছেলে ভিজে বাড়ি ফিরেছে, জ্বরজারি আসছে না তো! অতি কষ্টে একটু খানি খেয়ে দীপু নিজের ঘরে চলে যায়। এক অব্যক্ত বেদনা বুকে চেপে বসে আছে। ছোটবেলার খেলার সাথী হঠাৎ যেন হারিয়ে যাচ্ছে। এই একমাত্র বন্ধুকেই তো সে সব কিছু বলত। বন্ধুত্বের বাইরে কোনদিন তো কিছু ভাবেনি, তবে আজ কেন এত কষ্ট পাচ্ছে সে? অশ্রুসিক্ত চোখে কখন ঘুম নেমে এসেছে, সে জানতেও পারেনি। নিত্য দিনের মতো সকালের সব কাজ সেরে ইউনিভার্সিটি গেছে। আর ক'টা দিন মাত্র ক্লাস হবে তারপর ফেয়ারওয়েল, ইউনিভার্সিটি জীবনের থেকে ইতি।

...ক্রমশ■
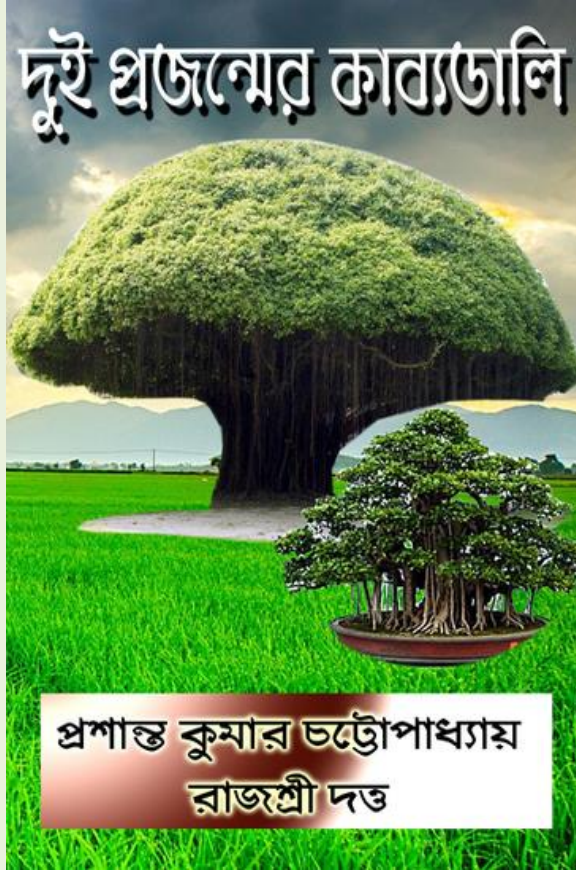
দুই প্রজন্মের দর্শনের ওপর ভিত্তি করে, বর্তমানের কিছু চিত্র শুধু ভাষার মাধ্যমে একত্রে উপস্থাপন করেছেন দুই প্রজন্মের দুই কবি। আধুনিক কবিতা প্রেমীদের জন্য একটি অসামান্য কবিতা সংগ্রহ।

শালিকের বাসা

শান্তিপদ চক্রবর্ত্তী

অনেকদিন ধরে নন্দিনী লক্ষ্য করছে রান্নাঘরের চিমনির আউটলেট পাইপের ভিতর পাখি বাসা বেঁধেছে। তাই ধোঁয়া ঠিকমতো বেড়োচ্ছে না, চিমনি খুব তাড়াতাড়ি তেল চিটচিটে হয়ে যাচ্ছে। না, পাখিগুলোকে তাড়াতেই হবে ভেবে, একটি লাঠি দিয়ে খোঁচা মারতেই পাইপের বাহির প্রান্ত দিয়ে দুটি শালিক পাখি উড়ে গেল। কিন্তু তা সত্ত্বেও পাইপের ভিতর কিচিরমিচির আওয়াজ হয়েই যাচ্ছে। দুটি শালিকপাখি পাশাপাশি উড়ে বেড়াচ্ছে আর বার বার পাইপের ভিতর ঢোকার চেষ্টা করছে। বোঝা গেল পাইপের ভিতরে শালিক পাখির বাচ্চা আছে, যারা উড়তে পারে না। তাই চিৎকার করে তারা বাবা-মাকে ডাকছে তাদের নিরাপত্তার জন্য। কোথা থেকে নন্দিনীর ভাই এসে বলল, “পাখির বাসাটা ভাঙতে হবে, তুই সর, আমাকে একটা টুল দে, আমি পাইপের আগাটা বার করে পাইপের ভিতরে শুকনো ডালপালা, ঘাস-পাতা বার করে পরিষ্কার করে দিচ্ছি।”

নন্দিনী বললো, “তাহলে বাচ্চাগুলোর কি হবে?” ভাই বলল, “কি আর হবে, বাচ্চাগুলোকে ফেলে দেব।”

“কিন্তু ওরা তো উড়তে পারে না, ফেলে দিলে ওরা তো মরে যাবে বা কাক এসে ছোঁ মেরে নিয়ে যাবে।”

“হ্যাঁ যাবে, তাতে কি হবে? উৎপাত থেকে তো বাঁচা যাবে।” নন্দিনী আবেগময় কণ্ঠে বলল, “ঐ বাচ্চাগুলো জানে এটাই তাদের বাবা-মায়ের বাড়ি, একমাত্র আশ্রয়, তাই ওরা নিশ্চিন্তে আছে। ওদের তাড়িয়ে দিলে বাচ্চাগুলো মরে যাবে। আচ্ছা ভাই, আমিও তো বাবা-মা, তোদের বাড়িতে আছি। বাবা-মার অবর্তমানে তুই কি এমনি করে আমাকে তাড়িয়ে দিবি, পথে ফেলে দিবি? নন্দিনীর দু-চোখ জলে ভরে গেল।”

ভাই কাঁধে হাত রেখে বলল, “আমার ভুল হয়ে গেছে দিদি, আর কখনো এমন কথা বলবো না রে দিদি, এইবারটির মত আমায় মাফ করে দে দিদিভাই।” এই বলে ভাই পাখির বাসা ভাঙা থেকে বিরত হোল।

নন্দিনী ডিভোর্সী। বছখানেক ধরে বাপের বাড়িতে আছে। বছর দু’এক আগে রজতের সঙ্গে তার বিয়ে হয়। রজত ব্যাঙ্কে চাকরি করে। সম্ভ্রান্ত পরিবারে নন্দিনী-রজত, শ্বশুর-শ্বাশুড়ি, ভাসুর-জা ও তাদের একমাত্র মেয়ে, এই নিয়ে ভরা সংসার। ভাসুরের পেট্রোল পাম্পের ব্যবসা। সব কিছু দেখেশুনে বাবা বিয়ে দিয়েছিলেন। কিন্তু নন্দিনীর কপালে বৈবাহিক সুখ জুটলো না। বিয়ের পর থেকেই রজতের মধ্যে সে কিছু অস্বাভাবিকতা লক্ষ্য করল। আর তার মুলে হল বড়জা। বড়জা যত না রূপসী তার চেয়ে অনেক বেশী

যৌবনবতী। সারা সংসারে তার দাপট সবচেয়ে বেশি ছিল, এদিক থেকে ওদিক হলে কাউকে সে কথা শোনাতে ছাড়তো না। নন্দিনীর স্বামী বৌদির কাছে কেঁচো হয়ে থাকত। নন্দিনীর দাম্পত্য জীবনের ব্যক্তিগত ব্যাপার বা সমস্যা ইত্যাদি হলেও রজত বলতো, "দাঁড়াও আগে বৌদিকে জিজ্ঞাসা করি।" সে ছিল বৌদি অন্ত প্রাণ। এই জায়গাতেই নন্দিনীর তীব্র আপত্তি ছিল।

মাস ছয়েক কাটার পর নন্দিনী বুঝতে পারল বৌদির সঙ্গে রজতের অবৈধ সম্পর্ক আছে। নন্দিনী শত চেষ্টা করেও স্বামীকে ফেরাতে পারেনি। ঝগড়া-অশান্তি করেও কোন লাভ হয়নি। শেষমেশ ঐ বাড়ি ছেড়ে চলে এসেছিল নন্দিনী। বাবা-মা অনেক বুঝিয়েছিল নন্দিনীকে, "দ্যাখ মা, সবকিছু বুঝে এই সিদ্ধান্ত নিয়েছিস তো?"

নন্দিনী উত্তরে বলেছিল, "একটা কন্যা সন্তান মাতৃক্রোড়ে জন্ম নিয়ে আস্তে আস্তে বাবা-মায়ের কাছে বড় হয়। তারপর একদিন বিয়ে হলে সে শ্বশুর বাড়ি চলে যায়। বাকি জীবনটায় সেটাই তার সংসার, সবকিছু। কিন্তু তার দ্বিতীয় আশ্রয়ের ভিতটুকু যদি নড়ে যায় তাহলে সে কিসের ভরসায় তার বাকি জীবনটা কাটাবে বলো? কত মেয়ের তো বিয়েই হয় না, কতজন শারীরিক বা মানসিক ভাবে প্রতিবন্ধী হয়, তাদের তো বাবা মায়ের কাছে থাকতে হয়, আর তা না হলে জোটে কোন আশ্রম বা রাস্তার জীবন।"

আস্তানা

আর কিছু বলার আগেই বাবা-মা নন্দিনীকে বুকে টেনে নিয়েছিল। বলেছিল বাকি সারাটা জীবন তুই তোর নারী স্বাধীনতা নিয়ে মাথা উঁচু করে এখানেই থাক, তোর ভাইও এমন কিছু করবে না যে তোর এখানে থাকাটা অনিশ্চিত হয়ে যাবে।

এরপর নন্দিনী ডিভোর্সের সুট ফাইল করেছিল। রজত মিউচুয়াল ডিভোর্স চেয়ে বেশ কিছু লক্ষ টাকা দিয়ে নন্দিনীর ক্ষতিপূরণ করতে চেয়েছিল। নন্দিনী তা রিফিউজ করে মিউচুয়াল ডিভোর্সের পেপারে সই করে দিয়েছিল। যে স্বামী নিজের স্ত্রীকে ভালোবাসে না, স্বীকার করে না, অন্য নারীর সঙ্গে তার সবকিছু বাটোয়ারা করে তার জীবন উপভোগ করে, তার দানের টাকা নিয়ে সে তাকে কোনমতে মহৎ হতে দেবে না। সম্পর্কের ইতি টেনে নন্দিনী বাপের সংসারে এক নির্ভরতার প্রতীক হিসাবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছে। নন্দিনী এম- এ- পড়েছে আর ভালো গান জানে অল্প কয়েকদিনের মধ্যে বেশ কিছু টিউশানি জুটিয়ে নিয়ে নিজেকে স্বাবলম্বী করে তুলল।

সেদিনটা শনিবার ছিল। নন্দিনী ব্রেকফাস্ট খেয়ে রান্নাঘরে ঢুকে আনাজপত্র কাটছে হঠাৎ কাক ও শালিক পাখির আওয়াজে সচকিত হয়ে উঠল। কি হলো এত গন্ডগোল কিসের? এত কাকের সম্মিলিত চেঁচামেচি কেন? রান্নাঘরের জানলা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে দেখে শালিক পাখির

আস্তানা

একটা বাচ্চা নীচে পড়ে ডানা ঝাপটাচ্ছে আর কয়েকটি কাক সেই বাচ্চাটিকে মুখে তুলে নিয়ে যেতে চাইছে। শালিক পাখি দুটি প্রানপণ চেষ্টা করে কাকেদের ঠুকরে বাধা দিয়ে যাচ্ছে তার বাচ্চাকে বাঁচাবার জন্য। নন্দিনী তরতর করে সিঁড়ি দিয়ে নীচে নেমে এসে পাখির বাচ্চাটা সযত্নে তুলে ঘরে নিয়ে এল। কাকেরা রণে ভঙ্গ দিয়ে পালিয়ে গেল, কিন্তু শালিক পাখিদুটো সারাদিন রান্নাঘর, ডাইনিংয়ের জানলায় বসে ডাকাডাকি করে তাদের বাচ্চাকে ফেরৎ চাইল। নন্দিনী খুব যত্ন করে পাখিটির সেবা করতে লাগল। বাচ্চাটার একটা ডানা বেশ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। পরিস্কার করে তাতে ঔষধ লাগিয়ে দিয়ে ড্রপারে করে জল, দুধ খাইয়ে তাকে একটা পুরানো খাঁচার মধ্যে রেখে দিল। সারাদিন ধরে শালিকপাখি দুটো বাচ্চাটিকে কাছে পাবার জন্য ছটফট করতে লাগল। সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসতে শালিক দুটো বাসায় ঢুকে পড়ল। সন্ধ্যার পর বাচ্চাটা একটু চাঙ্গা হল। নন্দিনী তাকে দানা খাবার ও জল দিল। সে কয়েকটি দানা ও খানিকটা জল খেল। কিন্তু সারা খাঁচাতে ঘুরে ফিরে বাবা-মাকে খুঁজে বেড়াতে লাগল আর কিচিরমিচির করে ডাকতে লাগল। পাইপের ভিতরের অন্ধকার থেকে শালিকদুটি সাড়া দেবার পর সে শান্ত হল।

পরের দিন সকালে শালিকের চিৎকার চেঁচামেচিতে নন্দিনীর ঘুম ভাঙল। সে উঠে দেখলো, শালিক পাখি দু'টি

ডাইনিং টেবিলের জানালায় বসে চিৎকার চেঁচামেচি করছে। মা পাখিটা ভিতরে ঢুকে খাঁচার সামনে অস্থিরভাবে পায়চারি করছে, তার বাচ্চাটিকে নিয়ে যেতে চাইছে। এমতাবস্তায় নন্দিনী কি করবে বুঝে উঠতে পারলো না?

ইতিমধ্যে বাবা-মা, ভাই পাশে দাঁড়িয়ে নন্দিনীর কার্যকলাপ দেখতে লাগল। নন্দিনী খাঁচার দরজাটা খুলে দিয়ে সেটি গ্রিলের সঙ্গে বেঁধে আটকে দিল। সঙ্গে সঙ্গে মা পাখিটি খাঁচার ভিতর ঢুকে বাচ্চাটাকে আদর করতে লাগল আর তারপরই শালিক দুটি উড়ে চলে গেল। খানিকক্ষণের মধ্যে শালিক পাখিদ্বয় মুখে করে কেঁচো নিয়ে এসে বাচ্ছাটাকে খাওয়ালো। সেটা খেয়ে বাচ্চাটা ডানা ঝাপটাতে লাগলো ও আস্তে আস্তে দরজার কাছে গিয়ে দাঁড়াল। দুটো পাখি খাঁচার দুপাশে গ্রিলে বসে পজিশন নিয়ে নিল। বাচ্চাটা খাঁচার ভিতর ডানা ঝাপটিয়ে উড়বার চেষ্টা করল। প্রথমবার ব্যর্থ হল। শালিকদ্বয় তাদের ভাষাতে বাচ্চাটাকে কিছু বলল। শালিক পাখিদুটো একদম ভয় পাচ্ছে না। নন্দিনী একদম খাঁচার সামনে দাঁড়িয়ে আছে আর শালিকদুটি স্থিরভাবে গ্রিলে বসে আছে। হঠাৎ বাচ্চাটা খাঁচা থেকে বেড়িয়ে ডানা মেলে উড়ে পড়লো আর শালিকদুটি তাকে এস্কট করে উড়িয়ে নিয়ে গিয়ে সামনের গাছের ডালে বসাল। নন্দিনী আনন্দে শিশুর মত হাততালি দিয়ে বলে উঠল, "দেখছো পাখির বাচ্চাটা তার বাবা-মার কাছে ফিরে গেল, আর দেখো পাখিদের জীবনে সর্বশ্রেষ্ট শিক্ষা

উড়তে শেখা, সেটাও শিখে গেল। না, এখানেই শেষ নয়। বাচ্চাটাকে গাছের পাতার ঝোপঝাড় দেখে একটা ডালে ঠিকঠাক মতো বসিয়ে পাখিদুটি আবার গ্রিলে এসে বসল। আবার কি চাই? তোদের বাচ্চাকে ভালো করে তোদের কাছে তো ফিরিয়ে দিয়েছি!”

আর একটা বিস্ময় নন্দিনী ও তার পরিবারের জন্য অপেক্ষা করছিল। পাখিদুটি গ্রিলে বসে কিচিরমিচির করে বার বার মাথা ঝোঁকাতে লাগল। তারপর উড়ে চলে গেল। নন্দিনী চিৎকার করে বললো, “দেখেছো পাখিদুটি ঘাড় নাড়িয়ে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে গেল। বাবা-মা হলো সন্তানের শ্রেষ্ঠ আশ্রয়।”

কথাটা বলতে বলতে নন্দিনীর দু-চোখ জলে ভরে গেল। বাবা-মা, ভাই নন্দিনীকে কাছে টেনে নিয়ে বলল, “তুই দেখিয়ে দিলি বাবা-মা সন্তানের কাছে কি সম্পদ আর সন্তানের শ্রেষ্ঠ আশ্রয় হল তার পিত্রালয়।” এক চরম নির্ভরতায় নন্দিনী বাবা-মাকে বুকে জড়িয়ে বলল, “তোমাদের আমি ভীষণ ভালোবাসি। তোমরাই আমার ঈশ্বর।” তাদের চোখের জল মিলনাশ্রুতে পরিণত হল... ■

আলোকচিত্র

ছবির নামঃ ফেরারী পথিক...

চিত্রগ্রাহকঃ সোহম মন্ডল ✧ বয়সঃ ১৮ বছর

সবাই জানাবেন এই উদীয়মান চিত্রগ্রাহকের ছবিটি কেমন লাগল...

খোঁজ

অচেনা

অনির্বাণ বিশ্বাস

ষ্টেশনে ট্রেনটা এসে থামতেই অরিত্র তড়িঘড়ি ষ্টেশনে নেমে একটা স্টল থেকে সিগারেট কিনে, লম্বা একটা সুখটান দিয়ে যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচল। উফফ্ এক্সপ্রেস ট্রেনে তড়িঘড়ি উঠতে গিয়ে, সে সিগারেট ও জল দু'টই কিনতে ভুলে গিয়েছিল। জল ট্রেনে একটা হকারের কাছে পেয়ে গেলেও, সিগারেট খেতে না পেরে অরিত্র ছটফট করছিল। এমন একটা কামরায় সে বসে আছে যেখানে মানুষ খুবই কম। আর শীতের এতো রাতে লোকজনই বা কোথা থেকে আসবে? অফিসের কাজে ক্লায়েন্টের সঙ্গে মিটিং সেরে ফিরতে এত দেরী হবে সেটা সে ভাবতে পারেনি। ভাগ্য ভালো সিটিং রিজারভেশনটা সে করে রেখেছিল এক্সপ্রেস ট্রেনের, তাই একটু হলেও তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরতে পারবে। ট্রেনের হুইসেল বাজতেই সে তাড়াতাড়ি উঠে কামরার যে ফাঁকা জায়গায় বসেছিল, সেখানে এসে বসতে গিয়ে দেখলো একটা সুন্দরী স্মার্ট মেয়ে বসে আছে। সে একটু অবাক হলেও দেখে মনে মনে খুশিই হল। সিগারেটটা খেতে খেতে আড়চোখে সে মেয়েটাকে দেখতে লাগল। কথা বলার একটা সুপ্ত ইচ্ছে থাকলেও ঠিক সাহস পাচ্ছিল না।

খোঁজ

"আপনি সিগারেটটা না খেলেই ভালো হয়। আসলে জানলা বন্ধ থাকায় এর ধোঁয়াটা এদিকেই আসছে, আর আমি খুবই আনকমফরটেব্‌ল ফিল করছি। সো ইফ ইউ প্লিজ..." মেয়েটা একটু হেসে বলল।

"ওঃ সিয়োর, সরি। আসলে এটা আমার একটা বদ অভ্যাস।" এই বলে অরিত্র উঠে সিগারেটটা টয়লেটে গিয়ে শেষ করে এসে বসল। নানা অছিলায় সে তার সাথে গল্প করতে লাগল। "একটা কথা না জিজ্ঞেস করে পারছি না, এতো রাতে এই লাস্ট ট্রেনে আপনি রোজ ফেরেন কেন? ভয় লাগে না?"

মেয়েটা হেসে উঠে বলল, "ভয় লাগবে কেন? প্রতিদিনই আপনার মতো কিছু শুভাকাঙ্ক্ষী পেয়ে যাই। তাই আর এখন অসুবিধা হয় না।"

"এখানে আপনার বাড়ি কোথায়? স্টেশনের কাছেই?"

মেয়েটা এবার উপরে দাঁড়িয়ে বলল, "একদম পাশেই কিন্তু এখানে আমাকে এখন না নামলে অনেকটা ঘুরে যেতে হবে।" কথা বলতে বলতে অরিত্র খেয়ালই করেনি যে ট্রেনটা টিকিয়াপাড়া ছাড়িয়ে ধীরগতিতে হাওড়ার দিকে যাচ্ছে। আর মেয়েটা ঐ রানিং ট্রেন থেকে লাফিয়ে নেমে রেললাইনগুলো টপকে দৌড়ে অন্ধকারে কোথায় যেন মিলিয়ে গেল। কি দুঃসাহসী মেয়ে রে বাবা!

বাড়ি ফিরে থেকে মনটা ভারী ফুরফুরে লাগছিল। এরপর থেকে সে নিজে থেকেই অফিসের ঐদিকে কাজ থাকলে

চেয়ে নিত। আর সেই লাস্ট ট্রেনে চড়ে একটু খুঁজে ঐ মেয়েটার সঙ্গে গল্প করতে করতে বাড়িতে ফিরত। এইভাবেই তার সাথে বন্ধুত্বটা বেশ জমে উঠল। অরিত্রর মনটা মেয়েটাকে দেখার জন্য ছটফট করত। সে মাঝে মধ্যে কাজ না থাকলেও ঐদিকে গিয়ে শেষ ট্রেনে মেয়েটার সঙ্গে গল্প করতে করতে ফিরবে বলেই যেত। শেষে সে ঠিক করল এবার একদিন মনের কথা বলে দেওয়াই ভালো। সেই মতো একদিন সে একটু ইতঃস্তত করে বলল, "তোমার নামটাই জানা হয়নি? তুমি এতদিন বিয়ে করোনি কেন? মানে এতো সুন্দরী মেয়ের তো বিয়ের সম্মন্ধ আসারই কথা..."

সে হেসে বলল "আমার নাম রিঙ্কু। তুমি এটা জানো না 'অতি বড়ো সুন্দরীর না জোটে বর, আর অতি বড়ো ঘরণীর না জোটে ঘর' — আমারও ধরো সেরকম অবস্থা।"

অরিত্র মনে মনে আনন্দই পেল। সে এবার একটু মনের জোর করে বলল, "অনেকদিন ধরেই ভাবছি তোমাকে বলব যে, তোমাকে আমার খুবই ভালো লাগে। তোমার যদি আপত্তি না থাকে, আমি তোমাকে বিয়ে করতে পারি। আমি ভালো একটা চাকরি করি, আমার নিজের বাড়ি ও আছে। তুমি রাজি থাকলে... আমি তোমার বাড়িতে গিয়ে কথা বলতে পারি।"

রিঙ্কু বিষণ্ণ হেসে বলল, "একথা তো আরও একজন বলেছিল। কিন্তু আমারই কপাল পোড়া। সবার ভাগ্যে সুখ

খোঁজ

সয়না জানো তো? তুমি তাই আমায় নিয়ে স্বপ্ন দেখো না বুঝেছ? ভালোবাসার মানুষকে না পেলে বড়ো কষ্ট। মরে বেঁচে থাকা। শুধু ঘুরে ঘুরে মরা। এর থেকে মুক্তি নেই গো। তাই তুমি আমাকে ভুলে যাও।"

অরিত্র জোর দিয়ে বলল, "আমি তোমার পূর্বজীবন সম্পর্কে জানতে আগ্রহী নই। তুমি শুধু বলো তুমি আমাকে বিয়ে করতে রাজি কিনা?"

রিঙ্কু একটু গম্ভীর হয়ে বলল, "কি পাগলামো শুরু করলে বলো তো? তোমাকে তো বললাম আমার ভাগ্যে সুখ সয়না। তুমি আমার থেকেও অনেক সুন্দরী ভালো মেয়ে পাবে। তার সাথে ঘর কর।"

অরিত্র এবার উত্তেজিত হয়ে বলল, "আমি বিশ্বাস করি মানুষ নিজের ভাগ্য নিজেই তৈরী করে। আমি তোমাকে ছাড়া বাঁচবো না। তুমি বিশ্বাস করো, তুমি একটু দরকার হলে সময় নাও। আমি তোমার সব দুর্ভাগ্যকে সৌভাগ্যে পরিণত করে দেব।"

রিঙ্কু বিমর্ষ মুখে হেসে বললো, "পাগল একটা। এবার আমায় যেতে হবে। পারলে আমাকে ভুলে যেও। মহাকালের গহ্বরে সবকিছুই তলিয়ে যায়। আসি..."

কথা বলতে বলতে কখন যে টিকিয়াপাড়া ছাড়িয়ে ধীরগতির ট্রেনটা যাচ্ছিল সে ভুলেই গেছিল। রিঙ্কুর রোজকার মতো চলে যাওয়ার দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে অরিত্রর চোখটা ঝাপসা হয়ে আসছিল। বুকটা হু হু

করছিল। চোখটা মুছে, সিগারেটটা ধরিয়ে সে একটা বড়ো করে টান দিয়ে জানলা দিয়ে ধোঁয়াটা ছেড়ে দিল। রিঙ্কুর বসার জায়গায় চোখ পড়তেই সে দেখল একটা খবরের কাগজ পড়ে আছে। এই কাগজটা তো ওর হাতেই ছিল। তাহলে কি ভুল করে ফেলে গেল?

একবার সে ভাবলো "ধূর! কি হবে কাগজটা দেখে! যখন ভদ্র ভাবে সে তাকে রিফিউজই করে গেল।" তাছাড়া না জানে সে তার ঠিকানা, না জানে তার ফোন নম্বর। তাহলে কি করেই বা তাকে পৌঁছবে? তাই সে মন দিয়ে সিগারেট খেতে লাগলো। তারপর একবার মনে হলো, যদি কোনো ইম্পরট্যান্ট নিউজ থাকে তবে? তাছাড়া এটার মাধ্যমে তার সঙ্গে আরও একবার দেখা করার সুযোগটা সে হাতছাড়া করতে চাইল না। যদি তার মত বদলায় – অথবা এবারে সে তার বাড়ির ঠিকানা নিয়ে তার বাড়িতেই চলে গিয়ে বলবে, যে কোন পরিস্থিতিতে সে তাকে বিয়ে করতে রাজি। মনে হয় আগে হয় প্রেমে ব্যর্থ হয়েছে, না হয় কোনো কারণে হয়তো বিয়ে ভেঙে গেছে – তাই সে আর এ পথেই যেতে চাইছে না। না কাগজটাই এখন তার কাছে তুরুপের তাস। অরিত্রর মনে শেষ একটা আশার আলো জ্বলে উঠল।

সে কাগজটা নিয়ে একবার ভাবল ব্যাগে পুরবে। তারপর ট্রেনটা কিছুটা এগিয়ে আবারও থামাতে হাতে কিছুটা সময় পেল। অরিত্র ভাবল, দেখি একবার চোখটা বুলিয়ে। সে

কাগজটা পড়তে লাগল। হঠাৎই এক জায়গায় এসে একটা নিউজ বেশ লাল কালিতে ঘিরে রাখা আছে দেখে, সে বেশ আগ্রহ ভরে পড়তে লাগল। খবরটা পড়ার পরে তার হাত থেকে কাগজটা পড়ে গেল।

খবরে যা লেখা ছিল তার সারসংক্ষেপ হল — "লাস্ট ট্রেনে ফেরা একটা মেয়েকে একা পেয়ে কয়েকজন মিলে তাকে নির্মমভাবে ধর্ষণ করে টিকিয়াপাড়ার কাছে ট্রেন থেকে ছুঁড়ে ফেলে দেয়। বাড়ির লোকজনের কাছ থেকে শোনা যায়, মেয়েটার বিয়ের ঠিক হয়ে গিয়েছিল এবং সে তার হবু স্বামীর সঙ্গেই ফিরছিল। তার হবু স্বামীকে মারধোর করাতে সে তার হবু স্ত্রীকে ফেলে পালিয়ে যায়। দোষীদের খোঁজ চলছে। পুলিশ এখনো কাউকে খুঁজে পায়নি।" ■

বাজি ধরা

রিয়া মিত্র

বিড়িতে একটা সুখটান দিতে দিতে বেদো আকাশের দিকে তাকিয়ে বলল, "চল্, একটা বাজি ধরা যাক্, হোদোল।" হোদোল ওর দিকে ফ্যালফেলিয়ে তাকিয়ে বলল, "বাজি! হঠাৎ করে বাজি ধরতে যাব কেন? পকেট এমনিই গড়ের মাঠ, তার মধ্যে এসব উদ্ভট চিন্তা-ভাবনা কেন!"

বিড়িটা ফেলে পা দিয়ে পিষে বেদো বলল, "আরে, গড়ের মাঠ বলেই তো একটা দারুণ প্ল্যান ছকে ফেলেছি। এই বাজি ধরেই দেখবি হয় তোর পকেটে, নয়তো আমার পকেটে কেমন বানের জলের মতো হুড়হুড় করে টাকা ঢুকছে।" হোদোল নিজের ঠিকরে বেরিয়ে আসা চোখ দুটো মার্বেল গুলির মতো বড় বড় করে বলল, "তাই নাকি? শুনি কেমন ধরণের বাজি?"

বেদো ঘাসের ওপর জম্পেশ করে গুছিয়ে বসে বলল, "তোর পকেটে কত টাকা এখন আছে, সেটা আগে বল।" হোদোল আকাশের দিকে তাকিয়ে কিছুক্ষণ ভেবে-চিন্তে বলল, "ঐ মেরে কেটে পঞ্চাশ টাকা।"

"হ্যাঁ, হ্যাঁ, ওতেই হবে।"

"কিন্তু করতে হবে কী!"

ফন্দি

"শোন্, এই মাঠটা এক পাক ঘুরে আসতে হবে দু'মিনিটে। যদি ঘুরে আসতে পারিস, তাহলে তুই আমাকে পঁচিশ টাকা দিবি আর যদি না পারিস, তাহলে তুই আমাকে ত্রিশ টাকা দিবি।"

হোদোল হেঁ হেঁ করে হেসে বলল, "এ আর এমন কী কাজ! আজকে তোর পাঁচ টাকা গেল, রে বেদো" বলেই হোদোল পড়িমড়ি করে দৌড় লাগাল এবং দু'মিনিটের মধ্যেই একপাক দৌড়ে চলে এল। বেদো ব্যাজার-মুখে বলল, "তুই তো দু'মিনিটের মধ্যেই চলে এলি, রে হোদোল।" খিকখিক্ করে হেসে হোদোল ওর হাতে পঁচিশটা টাকা দিয়ে বলল, "এ নে, গেল তো তোর পাঁচটা টাকা। বাজি ধরে হারলি তো।" বেদো ততোধিক দুঃখিত মুখে বলল, "ঠিক আছে, আরেকটা লাস্ট বাজি ধরা যাক্ তবে।"

"হেঁ হেঁ, এবারও কিন্তু তুই হারবি, বেদো।"

"আচ্ছা, দেখাই যাক্।"

"এবারের বাজিটা শুনি।"

"আমার হাতে তো ঘড়ি নেই কিন্তু তবুও আমি এখন সঠিক সময়টা যদি বলতে পারি, তবে তুই আমাকে পঁচিশ টাকা দিবি।

"অসম্ভব! ঘড়ি না দেখে সঠিক সময় বলা তোর পক্ষে কিছুতেই সম্ভব নয়, তুই কিন্তু কাউকে জিজ্ঞাসা করতে পারবি না।

"ঠিক আছে, কাউকে জিজ্ঞাসা করব না।" বেদো আর হোদোল মাঠের থেকে উঠে এসে দাঁড়ায় পাড়ার ক্ষেন্তি পিসির বাড়ির সামনে। বেদো কয়েকটা ঢিল কুড়িয়ে নিয়ে ছুঁড়তে থাকে ক্ষেন্তি পিসির টিনের চালে। রাগে চিৎকার করতে করতে বেরিয়ে আসে ক্ষেন্তি পিসি, "হতচ্ছাড়া, মর্কটের দল, রাত-দুপুরে একটু জিরোতে দেবে না আমায়! দুপুর তিনটের সময়ও ঢিল ছুঁড়ছে আমার চালে! হাতের সামনে পেলে সব কটাকে কুচো কুচো করে কাটব, এই বলে দিলুম।" বেদো হাসি হাসি মুখে হোদোলের দিকে তাকিয়ে বলল, "তিনটে বাজে এখন। দে, পঁচিশ টাকা।" হোদোল ব্যাজার মুখে পকেট থেকে ঝেড়েমুছে পঁচিশ টাকা বের করে বেদোর হাতে দিয়ে বলল, "ধ্যুর্, তোর সাথে আর বাজি ধরব না। আগের বার জিতলেও এবারটা তো আমি হেরে গেলাম।" বেদো বন্ধুর গলা জড়িয়ে ধরে বলল, "আহা, দুক্ষু পাস না, হোদোল। আমার জেতা মানেই তো তোরও জেতা। তুই আমার প্রাণের দোস্ত। আমার কাছে টাকা আসা মানেই তোর কাছেও টাকা আসা। এই নে, এই আনন্দে এই বাজি জেতার টাকা দিয়ে কেনা দুটো বিড়ি তোকে গিফ্টি দিলুম।" আনন্দে গদগদ হয়ে নিজের টাকা দিয়েই কেনা বিড়িতে আগুন ধরিয়ে হোদোল বলল, "তুই আছিস বলেই এই অভাবের বাজারে দুটো বিড়ি খেতে পারলুম, সত্যি তুই আমার সাচ্চা দোস্ত..." ■

মেঘের আড়ালে

রাজশ্রী দত্ত (নীলাঞ্জনা)

কপালের ঠিক মাঝখানে একটা সুন্দর কল্কা করে তার কেন্দ্রবিন্দুতে ছোট্ট একটা লাল টিপ দিলেই ব্যস মুখের শ্রী জ্বলজ্বল করবে দিনের প্রথম আলোয়। সারারাত ধরে অক্লান্ত পরিশ্রমের পর এই অপরূপ মনোমুগ্ধ করা মুখশ্রী দেখেই অপূর্ব ভুলে যায় তার সব ব্যাথা। কিন্তু দিনের আলো ফোটার আগেই কোত্থেকে উটকো কালিমাখা মেঘ এসে ভীড় জমিয়েছে তার বাড়ির চাতালের ওপর। অপূর্ব হাতের কাজ শেষ করে, চটপট কালীমায়ের মূর্তিটি ঘরের ভিতরে তুলে নিয়ে গেল। একটু পরেই তাকে এই কালী মূর্তিটি পৌঁছে দিতে হবে চৌধুরীদের বাড়ি। প্রত্যেকবার পুজোতেই পুরবী নিজে এসে অর্ডার দিয়ে যায়, আর সাথে অপূর্বকে পুজোতে যাওয়ার জন্য নিমন্ত্রণও করে যায়। কিন্তু অপূর্ব প্রতিমা পৌঁছে দিলেও নিজে কখনও পুরবীর বাড়ি যায় না। কিন্তু এ বছর অপূর্ব সেরকম কাউকে পায়নি যে তার হাত দিয়ে প্রতিমা পাঠাবে। বেশি অর্থ দিয়ে লোক ভাড়া করার সামর্থ্যও তার নেই। তাই অনিচ্ছা সত্ত্বেও তাকেই যেতে হবে।

পুরবী আর অপূর্ব একই আর্ট কলেজে পড়ে। পুরবী একদিকে খুব সুন্দরী, আবার অন্যদিকে অগাধ সম্পদের অধিকারী। তবে এতো ধনী ঘরের মেয়ে হওয়া সত্ত্বেও একটা সুন্দর মনের মানুষ সে। তাই তো অপূর্বর মতো হা-ভাতে ঘরের ছেলেই তার

সবচেয়ে প্রিয়বন্ধু। অপরদিকে অপূর্ব এক মধ্যবিত্ত বাড়ির ছেলে। সে নিজের চেষ্টাতেই স্কলারশিপের অর্থে পড়ছে, আর তার সাথে সাথে মূর্তি গড়ার কাজ করে এবং ছোটদের আঁকা শেখায়।

দুপুরবেলা অপূর্ব ছোটো হাতি করে পুরবীর বাড়িতে প্রতিমাটি নিয়ে এল। তাকে দেখা মাত্রই বাড়ির লোক থেকে শুরু করে আশপাশের সবাই কানাকানি আরম্ভ করে দিল। কেউ বা আড়ালে, কেউ বা প্রকাশ্যেই হাসাহাসি ব্যঙ্গ করতে শুরু করল। অপূর্ব মাথা নীচু করে নিজের কাজ সেরে বাকি টাকা নিয়ে চলেই যাচ্ছে, ঠিক সেই সময় কোথা থেকে এসে পুরবী তার সামনে দাঁড়াল। পুরবী আশপাশের লোকের প্রতিক্রিয়া দেখে ভ্রু কুঁচকে তাকে বলল, “আমাকে না বলে চলে যাচ্ছিস? আর তুই মাথা নামিয়ে আছিস কেন?”

অপূর্ব নির্লিপ্ত সুরে বলে, “না মানে প্রতিমা পৌঁছে দিলাম তোর বাড়ি, এবার আমি আসি... তুই তো সব বুঝিস, কেন আমি মাথা নীচু করে আছি...”

অপূর্বর কথা শুনে পুরবী তার হাত ধরে টানতে টানতে ঠাকুর দালানের সামনে এনে বলল, “তোমরা সবাই একে দেখে হাসছ, তাই তো? কিন্তু মানুষের পরিচয় কি তার রূপ না তার গুণ? হ্যাঁ, অপূর্বর যা গুণ আছে, তা এখানে আর কারোর নেই। আর তাই জন্য ও আমার প্রিয় বন্ধু। অপূর্বকে দেখে যদি আর কেউ একবার কটূক্তি করে, তাহলে তার সাথে আমার সব সম্পর্ক শেষ। কারণ মনুষ্যত্ব সবচেয়ে বড় সম্পদ।”

পুরবীর কথায় সবাই চুপ হয়ে মাথা নীচু করে চলে যায়। হ্যাঁ অপূর্বকে দেখতে কুৎসিত। ছোটবেলায় আঁশ বঁটিতে তার পা কেটে

গিয়ে রক্তে ইনফেকশন হয়ে যায়। সেই থেকে সারা শরীর কালো কালো ক্ষতর মতো হয়ে যায়। মুখটাও বাদ যায়নি এই চামড়ার বিকৃতি থেকে। স্কুল কলেজ সব জায়গাতেই সবাই অপূর্বর থেকে দূরে দূরে থাকলেও, একমাত্র পুরবী সব সময়ই তার পাশে থাকে। দুজনের বন্ধুত্বও খুব দৃঢ়। অপূর্ব পুরবীকে খুব আগলে রাখে। বিশেষ করে সেইবারের ঘটনার পর... পুরবী আদিত্যর প্রেমে যখন একবারে হাবুডুবু খাচ্ছে, ঠিক সেই সময় সে জানতে পারে আদিত্য তাকে শুধুই ব্যাবহার করেছে, ভালোবাসেনি।

সেদিন পুরবীর সেই একাকীত্বে মাথা রাখার একমাত্র কাঁধ ছিল অপূর্বর। কিন্তু অপূর্ব জানে যে পুরবী কতটা ভালোবাসে আদিত্যকে। তাই নিজের অনুভুতিগুলোকে লুকিয়ে রেখে শত চেষ্টা করে আজ আবার কালীপুজোর রাতে সে ফিরিয়ে আনল আদিত্যকে। আদিত্য তার ভুল বুঝতে পেরেছে। অপূর্ব জানে – মনে মনে সে যতই পুরবীকে ভালবাসুক, সে হল ধনী ঘরের প্রতিমা। তাই অপূর্ব চিরদিনই থাকবে মেঘের আড়ালে। তবে আদিত্যকে ফিরে পেয়ে পুরবীর মুখে যে হাসিটা ফুটে উঠেছে সেটাই তার নগদ উপহার।

একমাস কেটে গেছে আজ পুরবীর সাথে আদিত্যর বিয়ে। অপূর্ব আলো আঁধার ঘেরা ঘরে বসে পুরবীর ছবি আঁকছে। ঠিক সেই সময় আঁধার ঠেলে ঘরে ঢুকল পুরবী। অপূর্ব চোখের ভ্রম ভেবে প্রথমে উপেক্ষা করল, কিন্তু না পুরবী সত্যিই তার সামনে দাঁড়িয়ে। পুরবী তাকে জড়িয়ে ধরে বলল, “আমাকে কি তুই মেঘের আড়াল থেকে ধরা দিবি না? আমি যে তোকে ভালবাসি...এইটুকু বুঝলি না?” ■

সবিনয় নিবেদন

‘গুঞ্জন’ কেমন লাগল তা অবশ্যই আমাদের জানাবেন। আর আপনার লেখা গুঞ্জনে দেখতে হলে, আপনার সবচেয়ে সেরা (আপনার বিচার অনুযায়ী) এবং অপ্রকাশিত লেখাটি আমাদের ‘ই-মেল’ (contactpandulipi@gmail.com) এ পাঠিয়ে দিন (MS Words + PDF দু’ট ফরম্যাটই চাই)। সঙ্গে আপনার একটি পাসপোর্ট সাইজের ছবিও অবশ্যই থাকা চাই – সাইজঃ ৩৫ mm (চওড়া) X ৪৫ mm (উচ্চতা); রিসল্যুশনঃ 300 DPI হওয়া চাই। আর Facebook এর ‘পাণ্ডুলিপি’ ‘গ্রুপে’ত অবশ্যই আপনার নিয়মিত উপস্থিতি একান্ত প্রার্থনীয়। তবে লেখা অনুমোদনের ব্যাপারে বিচারক মণ্ডলীর সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত।

বি.দ্র.: জানুয়ারি ২০২২ সংখ্যার লেখা পাঠানোর শেষ তারিখঃ ১৫ই ডিসেম্বর, ২০২১

আজকের আপনজন

প্রশান্তকুমার চট্টোপাধ্যায় (পিকে)

বড় জ্যাঠা প্রবীণ বাবুদের সাথে সৌমেনদের সম্পর্ক কোনদিনই খুব একটা মধুর ছিলনা। নেহাত একই পাড়ায় থাকার কারণে, রাস্তাঘাটে দেখা হয়ে গেলে একটু সৌজন্যমূলক কথাবার্তা বা দূর থেকে একটু মুচকি হাসি।

প্রবীন বাবু সরকারি পূর্ত বিভাগের বড় কন্ট্র্যাক্টর। তাঁর দুই ছেলে – শ্যামল ও কমল। ওরাও ওদের বাবার পথেই এগোচ্ছিল। ওঁদের বাড়িতে প্রায়ই পদস্থ সরকারি আধিকারিকদের – এমন কি মাঝেমধ্যে দু'একজন মন্ত্রীরও আনাগোনা চলত। সৌমেনের বাবা পাড়ারই একটা কারখানায় লেদ মেশিন চালাতেন। কাজেই এই নিম্নবিত্ত পরিবারের লোকেদের সাথে বেশি যোগাযোগ রাখলে তাঁর কর্মবৃত্তে যে এক হাস্যকর পরিস্থিতির সৃষ্টি হতে পারে সে ব্যাপারে তিনি ষোল আনা সচেতন ছিলেন।

কিন্তু সিভিল সার্ভিস-এর পরীক্ষায় ভাল ফল করে, সৌমেন সরকারি চাকরিটা পাবার পর থেকেই, হঠাৎ করে সব বদলাতে লাগল। ঘটনাচক্রে তার পোস্টিংটাও হল রাজ্যের পূর্ত বিভাগেই। খবরটা জ্যাঠাদের কাছে পৌঁছতে

কয়েক দিন সময় লেগেছিল। কিন্তু যেদিন প্রবীন বাবু খবরটা জানলেন, সেদিনই সন্ধ্যায় একগাদা মিষ্টি নিয়ে হাজির হলেন সৌমেনদের বাড়িতে। সে কি অমায়িকতা! আবেগে গদগদ হয়ে জ্যাঠা বললেন, “আমি জানতাম আমাদের বংশের ছেলে ঠিক তার যোগ্যতায় কোন না কোন সরকারি সংস্থায় স্থান করে নেবে।”

####

প্রায় দু’বছর কেটে গেছে। এখন জেলার সমস্ত বড় প্রকল্পই সৌমেনের হাত দিয়ে অনুমোদিত হয়। একদিকে সে যেমন তার নিরপেক্ষ এবং সৎ স্বভাবের জন্য তুমুল খ্যাতির অধিকারি হয়েছে, অন্যদিকে তার বিভাগের বেশ কিছু কর্মচারী এবং বাইরের অনেক কন্ট্র্যাক্টর তার ওপর অত্যন্ত অসন্তুষ্ট। সে নিজে ঘুষ নেয় না, আর কারুকে তা নিতেও দেয় না। অগত্যা তার হাতে ক্ষমতা আসার পর থেকেই, এই বিভাগের অনেক দুর্নীতি পরায়ণ লোকের উপরি আয় বেশ কমে গেছে। কন্ট্র্যাক্টরদের মধ্যে যাঁরা আগে খুব আজেবাজে নোংরা কাজ করতেন, তাঁদের অনেকেই এখন বদলে গেছেন, কিন্তু কেউ কেউ আড়ালে সৌমেনের বিরুদ্ধে বিভিন্ন চক্রান্তের সূচনা শুরু করে দিয়েছেন।

শ্যামল কমল বেশ কয়েকবার তাদের বিভিন্ন পরিচিত ব্যক্তির হয়ে সৌমেনের কাছে সুপারিশ করতে এসে বিফল হয়ে ফিরে গেছে। কিন্তু ধুরন্ধর ব্যবসায়ী প্রবীণ বাবু

সৌমেনেদের সাথে তাঁর সম্পর্কের ঘনিষ্ঠতা উত্তোরোত্তর বাড়াতেই যত্নবান হয়ে চলেছেন। অনেক দিনই, বিভিন্ন অজুহাতে, সন্ধ্যায় সৌমেন বাড়ি ফিরলে, তিনি এসে তার সাথে খেজুরে গল্প জমান। সৌমেন জ্যাঠার উদ্দেশ্য বোঝে, আসলে কি কি নতুন সরকারি প্রকল্প আসছে, সেটাই উনি বার করতে চান।

####

বাঁশবেড়িয়া থেকে বকুলতলার মাঝে যে চওড়া আধমজা খালটা রয়েছে তার ওপর লোককে পার হতে হয় একটা বাঁশের সাঁকো দিয়ে। খবর এলো ওই জায়গায় এবার একটি পাকা-পোক্ত ব্রিজ বানানোর প্রকল্প নিয়েছে সরকার। যথা সময়ে ওই প্রকল্পের টেণ্ডার ছাড়া হল। সৌমেনের ওপরই ভার দেওয়া হল সব টেণ্ডার খুলে দেখে, সব দিকে নজর রেখে, শ্রেষ্ঠ বিডারকে (দরদাতাকে) নির্বাচিত করার।

টেণ্ডারগুলো খুলতে খুলতে জ্যাঠাদের কোম্পানির বিড-পেপারগুলোও দেখল সৌমেন। ওই কোম্পানির পূর্বে কোন ব্রিজ প্রকল্প সম্পাদন করার অভিজ্ঞতা না থাকায়, সে সরাসরি ওই কোম্পানিটিকে রিজেক্ট করে দিল।

####

রাতে খাবার পর, চিরদিনই বাড়ির সামনের অঙ্গনটাতে ঘন্টাখানেক পায়চারি করে সৌমেন। আজও তার ব্যতিক্রম হয়নি। আজ রাস্তার লাইটগুলো জ্বলেনি। হঠাৎ গেটের

বাইরে এক ছায়ামূর্তির মত কিছু দেখে, সৌমেন চেঁচিয়ে উঠল, "কে, কে ওখানে?" বাড়ির ভেতরে সে আওয়াজ পৌঁছতেই সবাই ছুটে বাইরে এল। কিন্তু ততক্ষণে দু'ট বুলেট ছুটে গেছে। সৌমেন মাটিতে পড়ে ছটফট করছে। বাড়ির কেউই আশপাশে কারুকে দেখতে পেলনা।

সবাই খুব তাড়াতাড়ি সৌমেনকে হাসপাতালে নিয়ে যেতে পারায়, এ যাত্রা সে প্রাণে বেঁচে যায়। মাঝরাতে জ্ঞান ফিরতে পুলিশ তার জবানবন্দি নেয়। পরদিন সকালে ঘটনাস্থলে সার্চ করতে গিয়ে, খুব একটা কিছু না পাওয়া গেলেও, পুলিশ সৌমেনদের গেটের সামনেই বোগেন ভেলিয়ার ডালে একটা ফেঁসে থাকা ফেস-মাস্ক পায়, যাতে কিছুটা রক্তও লেগে আছে। অনেকের মতই, জ্যাঠা এবং দুই জাঠতুত ভাইকেও পুলিশ জিজ্ঞাসাবাদ করতে গেল। ছোট ভাইটা একটু বেগড়বাই করতে ইন্সপেক্টর সাহেব সপাটে একটা চড় লাগালেন তার গালে, কেঁদে উঠে সে তার ফেস-মাস্কটা খুলতেই, তার গালের সদ্য আঁচড়গুলো স্পষ্টই দেখা গেল। দক্ষ ইন্সপেক্টর ছেলেটার হাতের আঙুলগুলোর দিকে তাকিয়ে, হাবিলদারকে বললেন, "একে গাড়িতে তোল।"

ফেস-মাস্ক থেকে ডি.এন.এ. টেস্টের পর, এবং কমলের আঙুলের গান-শট-রেসিডিউ টেস্ট থেকে সহজেই তাকে খুনী হিসাবে সনাক্ত করা গেল। কমলের কাণ্ড শুনে, পুরো পাড়ার লোক হতবাক... ■